N.S.T

ঠিক দশটায় ট্রেন এসেছিল

অনীশ দেব

ঘটনাটা আমি ভুলতে পারিনি—বোধহয় ভোলা যায় না বলেই। আর বারবার প্রশ্ন জাগে নিজের মনে: সেদিন আমি ঠিক দেখেছিলাম তো? না, একটু ভুল হল—সেদিন নয়, সে-রাতে। সে-রাতে আমি ঠিক দেখেছিলাম তো?

স্টেশনটার নাম সাতবহিনি। জীবনে কখনও তার নাম শুনিনি। তবে তাতে কোনও অসুবিধে নেই। সেল্‌সের লাইনে কাজ করি—নাম-না-জানা জায়গায় চষে বেড়ানোই আমাদের কাজ। সে-সব জায়গায় জিনিস বিক্রি করার মধ্যে একটা অন্যরকম মজা আছে।

আমাদের কোম্পানি একটা অদ্ভুত যন্ত্র বের করেছে। যন্ত্রটার কাজ হল মশা, মাছি, পোকামাকড় তাড়ানো। দেখতে ছোট—অনেকটা সেলুলার ফোনের মতো। ভেতরে যত রাজ্যের ইলেকট্রনিক সার্কিট। তবে যন্ত্রটা কাজ করে আলট্রাসনিক নীতিতে। অর্থাৎ, শব্দোত্তর তরঙ্গ তৈরি করে এমন কাণ্ড বাধিয়ে দেয় যে, মশা-মাছি-পোকামাকড় সেই শব্দ শুনে পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাতে থাকে। অথচ মানুষের কান সেই শব্দ মোটেই শুনতে পায় না।

বিজ্ঞান আমি জানি না, বুঝি না। কিন্তু যন্ত্রটা খদ্দেরকে গছাতে হলে তার ভেতরকার ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে খানিকটা অন্তত আইডিয়া থাকা দরকার। তাই ঠিক সেইটুকুই আমাদের কোম্পানির একজন এনজিনিয়ারের কাছ থেকে জেনে নিয়ে মোটামুটি মুখস্থ করে নিয়েছি।

কোম্পানির সঙ্গে কথা ছিল, গোমো, বারডিহি আর ডেহ্‌রি-অন-সোন, এই বেল্টটা আমি দু'সপ্তাহে কভার করব। মাইনে ছাড়াও আমাদের কমিশনের ব্যাপারটা বেশ অ্যাট্রাকটিভ। তাই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

প্রথমে হাওড়া থেকে চলে গেছি গোমো জংশন। সেখানে দিন পাঁচেক কাজ করেছি। তারপর একদিন বিকেলে গোমো থেকে পাটনা-হাতিয়া এক্সপ্রেস ধরে রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা নাগাদ পৌঁছে গেছি বারডিহি।

বারডিহিতে বেশি যন্ত্র বিক্রি করতে পারিনি। কে জানে, কপালটাই বোধহয় খারাপ ছিল! তাই দিনতিনেক পরই মনমরা অবস্থায় চড়ে বসেছি বারডিহি/ডেহ্‌রি-অন-সোন প্যাসেঞ্জারে। জায়গা দুটোর দূরত্ব মাত্র ১৪০ কিলোমিটার। কিন্তু টিক্‌টিক্ করে চলা গদাইলশকরী প্যাসেঞ্জার ট্রেন যে বেশ লেটে পৌঁছবে সেটা গোড়া থেকেই মালুম হয়েছিল।

শীতের সময়। তাই ডালটনগঞ্জ পেরোতে না পেরোতেই বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এল। মাঠঘাট ক্ষেত যা-কিছু দেখছিলাম সব মুছে গেল। গারওয়া রোড জংশন পেরোতেই আমার একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। হঠাৎই কোমরে আঁটা পেজারটা পিপ-পিপ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিল।

তাড়াহুড়ো করে যন্ত্রটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই মেসেজটা চোখে পড়ল। হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এসেছে, এখনই বারডিহিতে ফিরে যেতে হবে। সেখানে একটা কোম্পানি জরুরি ভিত্তিতে পঁচিশ পিস পোকামাকড় তাড়ানোর যন্ত্র চাইছে। বারডিহির কাজ সেরে তারপর যেন আমি ডেহ্‌রি-অন-সোন রওনা হই।

ইলেকট্রনিক্স ক্রমেই যে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে, পেজার এবং সেলুলার ফোন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শীতের সন্ধেয় প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যে শান্তিতে একটু ঝিমোব তারও উপায় নেই। কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সামান্য প্রলোভনও উঁকি দিয়েছিল আমার মনে। কারণ পঁচিশ পিস যন্ত্র বিক্রির কমিশন নিতান্ত ফেলনা নয়।

বারডিহিতে কোথায় যেতে হবে সেই হদিসও পাওয়া গেল পেজারে। এখন শুধু ট্রেন থামলেই নেমে পড়ার অপেক্ষা।

কম্বল মুড়ি দেওয়া দেহাতী এক সঙ্গীকে বার তিনেক ডাকাডাকি করে তারপর জানতে পারলাম, পরের স্টেশন সাতবহিনি।

অগত্যা ট্রেন থামতেই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় নেমে পড়লাম সাতবহিনিতে। সাত বোনের কোনও কাহিনি থেকে এই স্টেশনের নাম রাখা হয়েছে কিনা কে জানে! তবে যেখানে আমি নামলাম তা স্টেশন না শ্মশান বোঝা দায়।

আমার সঙ্গে একটা হাতব্যাগ আর একটা বিশাল ভারী সুটকেস। সুটকেসে রয়েছে আমাদের তৈরি যন্ত্র ইনসেক্ট সেন্টিনেল, যাকে আমরা সংক্ষেপে আই-এস বলি।

শীতের ভারী বাতাসে করুণ হুইসল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে গেল। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম কাঁকর-ছড়ানো নিচু প্ল্যাটফর্মে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু কুয়াশা আর ঠাণ্ডা বাতাস আমাকে জড়িয়ে রইল।

ভূতে আমার তিলমাত্রও বিশ্বাস নেই। তাছাড়া, ট্রাভেলিং সেল্‌সম্যানদের ভূতের ভয় থাকলে চলে না। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সাতবহিনির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চারপাশটা কেমন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে ঠেকছিল।

প্ল্যাটফর্মে টিমটিম করে দুটো ন্যাড়া বাল্‌ব জ্বলছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, ওদেরও শীত করছে। আর কুয়াশার চাপে ওদের আলো বেশিদূর ঠিকরে যেতে পারছে না।

সামনে-পেছনে তাকালে শুধু আঁধার। তার ফাঁকফোকরে কোথাও একটা কি দুটো আলোর ফুটকি। আর আকাশে আধখানা চাঁদ, তাকে ঘিরে সহচর কয়েকটি তারা।

একটা অদ্ভুত ধরনের ডাক আমার কানে আসছিল। তবে ঝিঁঝি নয়, হয়তো অন্য কোনও পোকামাকড়। মাঝে-মাঝে একটা কনকনে বাতাসের ঢেউ আমার জ্যাকেট-সোয়েটারের অন্দরমহল পর্যন্ত ঢুকে পড়ে একেবারে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্মের ওপরে, খানিকটা দূরে, একটা ছোট ঘর গোছের ব্যাপার চোখে পড়ল। বোধহয় স্টেশনমাস্টারের ঘর। সে যাই হোক, আগে ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া দরকার। নইলে এই ঠাণ্ডায় নির্ঘাৎ স্ট্যাচু হয়ে যেতে হবে।

সুটকেস আর ব্যাগ তুলে নিয়ে ঘরটার দিকে হাঁটা দিলাম। শীতের কামড়ে হাত-পায়ের জোড়গুলো প্রায় অকেজো হওয়ার জোগাড়। গায়ের জোরে নয়, স্রেফ মনের জোরে এগিয়ে চললাম। বারবার তেনজিং আর হিলারির কথা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার চারপাশে বরফ পড়ছে।

ঘরের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় গাঢ় অন্ধকারের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত প্রাণী আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রাণী বলছি, কারণ তার সারাটা শরীর কম্বল দিয়ে ঢাকা—অনেকটা কবন্ধের মতো। তবে মাথার কাছটায় সামান্য ফাঁক লক্ষ করলাম। সেই ফাঁকের ভেতর দুটো চোখ স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে এই মানুষটা?

'কাঁহা যাওগে, মহারাজ?' জড়ানো ভারী গলায় কবন্ধ প্রশ্ন করল।

আমি কোনওরকমে তাকেও বোঝালাম যে, আমি বারডিহি ফিরতে চাই।

তাতে জানতে পারলাম, সকাল সওয়া সাতটার আগে কোনও ট্রেন নেই। কারণ, ডেহরি-অন-সোন/বারডিহি প্যাসেঞ্জার ওই সময়েই সাতবহিনিতে আসে। তারপর সে জড়ানো গলায় বলল, কোই বাত নহি। রাতটা মাস্টারজির কামরায় থেকে যান।

আমি যেন সেই নেমন্তন্নের অপেক্ষায় ছিলাম!

সুতরাং আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ঢুকে পড়লাম মাস্টারজির ঘরে। আমার কবন্ধ-চেহারার শুভাকাঙ্ক্ষী তখন জড়ানো গলায় দেশোয়ালি গান গাইছে।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই কেমন অদ্ভুত একটা শিহরন খেলে গেল আমার শরীরে। ঘরটা যেমন বিচিত্র, তেমনই বিচিত্র ঘরের তিনজন মানুষ।

জানি, এরপর আমি যা বলব সেটা বিশ্বাস হওয়া কঠিন, কিন্তু আমার মিথ্যে বলার কোনও উপায় নেই।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই আমার মনে হল, ঠান্ডাটা যেন বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আজও মনে পড়ে, ব্যাপারটাতে আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পোড় খাওয়া সেল্‌সম্যানের সহজাত স্মার্টনেসে অবাক ভাবটাকে চট্ করে সামলে নিলাম। তারপর ঘরে হাজির তিনজন মানুষের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হেসে ঢুকে পড়লাম ঘরের অন্দরে। তারপর দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলাম।

চুন-সুরকির গাঁথুনি দিয়ে তৈরি ঘরটা মাপে মাঝারি। হয়তো দশ-বাই-পনেরো হবে। ঘরের মাথায় টিনের চাল। সেখান থেকে একটা উলঙ্গ বাল্‌ব ঝুলছে। ভোল্টেজ কম থাকায় তার আলোটা কেমন লালচে দেখাচ্ছে।

বাল্‌বের প্রায় গা ঘেঁষে ঝোলানো রয়েছে একটা বড় মাপের সিলিং ফ্যান। বাল্‌বটা ফ্যানের ওপর দিকটায় থাকায় ঘরের মেঝেতে আর দেওয়ালে ফ্যানটার বিচিত্র ছায়া পড়েছে। একটা ব্লেডের ছায়া ঘরের মানুষগুলোর গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে দেওয়াল পর্যন্ত।

ঘরের জানলা দুটো। কিন্তু ঠান্ডার জন্য দুটোই বেশ ভালো করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘরের বাঁ দিক ঘেঁষে বেশ বড় মাপের চৌকো কাঠের টেবিল। তার একদিকে একটা সাবেকি চেয়ার—মাস্টারজির চেয়ার। তার পাশেই একটা যন্ত্র রাখা আছে। বোধহয় খবর পাঠানোর টরে-টক্কা যন্ত্র।

টেবিলে বেশ কিছু কাগজপত্র ডাঁই করা রয়েছে। তারই মাঝে একটা বড় মোমবাতি দাঁড় করানো। আর টেবিলের শেষ প্রান্তে একটা কালো রঙের ধুলো পড়া টেলিফোন। চেহারা দেখে মনে হয় না গত পাঁচ বছরে ওটা কখনও বেজে উঠেছে।

টেবিলের এ-পাশে আরও দুটো চেয়ার—কাঠ, পেরেক আর টিনের পাত দিয়ে যথাসাধ্য তাপ্পি মারা। তারই একটার হাতলে একটা নস্যি রঙের কম্বল ভাঁজ করে রাখা। কম্বলের কাছাকাছি কয়েকটা মশা উড়ছে, পিনপিন করে শব্দ হচ্ছে।

ঘরের তিনজন মানুষ এককোণে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছিল। তাদের ঘিরে সিগারেট অথবা বিড়ির ধোঁয়া উড়ছিল। আমার কাষ্ঠহাসির উত্তরে একজন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল আমাকে : 'আইয়ে, সাব, আইয়ে। বেফিকর রহিয়ে, টিরেন টাইমপে আ জায়েগি—'

কথায় বোঝা গেল, এই ঘরটা বেশ কিছুদিন ধরেই ওয়েটিং রুমের ভূমিকা পালন করছে—দিনে না হোক, অন্তত রাতের বেলায়। নইলে আমাকে দেখামাত্রই 'ট্রেন সময়মতো এসে যাবে' এ-কথা ঘোষণার মানে কী!

শীতের প্রকোপ বেড়ে উঠতেই বেশ খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম ঘরের মানুষগুলোকে দেখে।

আগেই বলেছি ভূতের ওপরে আমার বিন্দুমাত্রও আস্থা নেই। আর এই তিনজনকে দেখে মোটেই চোর-ডাকাত বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অবাক হলাম। কারণ তিনজনের পোশাক-আশাক একেবারে তিনরকমের। মানে, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এই তিনজনের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, সচ্ছলতা, এসবের মধ্যে কোনও মিলই নেই। অথচ ওরা তিনজন কাছাকাছি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে!

প্রথমজন, যিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, হঠাৎই টেবিলের কাছে গিয়ে সাবেকি চেয়ারটায় বসে পড়লেন। অর্থাৎ, তিনি-ই বোধহয় মাস্টারজি।

তাঁর পরনে গরম কাপড়ে তৈরি কালচে রঙের প্যান্ট। গাঢ় সবুজ সোয়েটারের ওপরে ঘন নীল রঙের ব্লিল কোট এঁটে বসেছে। চেহারা মোটার দিকে হওয়ায় কোটটা মধ্যপ্রদেশ বরাবর যথেষ্ট

ফুলে রয়েছে। কোটের পকেট থেকে উঁকি মারছে দোমড়ানো-কোঁচকানো একটা রুমাল। আর দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। মাস্টারজির রঙ ময়লা। গলায়-মাথায় মাফলার। গোলগাল মুখে বয়েসের ভাঁজ। ঠোঁটের ওপরে কাঁচা-পাকা ঝাঁটা গোঁফ। ভুরু জোড়া প্রায় গোঁফেরই আত্মীয়। মাথার যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় ভদ্রলোকের অবস্থা একরকম ইন্দ্রলুপ্ত।

মাস্টারজি শব্দ করে নাক টানলেন কয়েকবার। তারপর পকেটের রুমাল দিয়ে নাকটিকে বাগিয়ে ধরে কষে ঝাড়া দিলেন দু'বার। রুমাল পকেটে রেখে সিগারেটে দুটো টান দিয়ে একটু সামলে নিয়ে আমাকে হিন্দিতে বললেন, 'বসুন, ওই চেয়ারটায় বসুন—'

হাতলে কম্বল ঝোলানো চেয়ারটিকে পেরিয়ে আমি পরের খালি চেয়ারটার কাছে গেলাম। হাতের সুটকেস ও ব্যাগ মেঝেতে নামিয়ে রেখে বসে পড়লাম চেয়ারে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঠান্ডায় শিউরে উঠলাম। পাশের চেয়ারের কম্বলটা আমার গায়ে দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কার-না-কার কম্বল, গায়ে দেওয়া ঠিক হবে না—এ কথা ভেবে চুপ করে রইলাম।

ঠিক তখনই ঘরের বাকি দুজন মানুষ টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমার দু'পাশে দুজন। বাল্‌বের আলোয় ওদের অদ্ভুত ছায়া পড়েছে টেবিলে, মেঝেতে।

একজনের চেহারা নিতান্তই কুলি-কামিন গোছের। গায়ের জামাকাপড়ও সেইরকম। মোটাসোটা, কুচকুচে কালো রঙ, চোখ লালচে, গা থেকে কেমন একটা বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে। দু'আঙুলে টিপে ধরা একটা বিড়িতে শেষ টান দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

কিন্তু তৃতীয়জনের চেহারা আর পোশাক তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো।

ফরসা সুন্দর মুখে আভিজাত্যের ছাপ। পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। পরনে হালকা ছাইরঙের থ্রি-পিস সুট। গলায় টাই। চোখে রিমলেস চশমা।

ভদ্রলোকের ডান হাতের মধ্যমা আর অনামিকায় সোনা-বাঁধানো দুটো পাথরের আংটি। আর কপালের বাঁ দিকে একটা বড় লালচে তিল।

চেয়ারে বসে খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিলাম, তবে শীত একটুও কমেনি। তার ওপর এই অদ্ভুত ঘরে এই তিনজন মানুষের জোট আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। কিন্তু উপায় কী! রাতটা চারজনে মিলেই কাটাতে হবে। সিগারেটের তেষ্টা পাওয়ায় একটা সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরালাম।

সিগারেটে সুখটান দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর কী বলব ভাবছি, এমন সময় মাস্টারজিই আমাকে বিপদ থেকে বাঁচালেন। বললেন, 'আপনাকে দেখে সেল্‌সম্যান বলে মনে হচ্ছে—'

আশ্চর্য! কী করে উনি বুঝলেন আমি সেল্‌সম্যান! এই পাঁচ বছর সেল্‌সে চাকরি করে-করে আমার চেহারায় কি সেল্‌সম্যানের স্পষ্ট ছাপ পড়ে গেছে? সেরকম কোনও ছাপ আবার হয় নাকি!

আমার অবাক ভাব দেখে চাপা হাসলেন মাস্টারজি। ছোট-হয়ে-আসা সিগারেটটা টেবিলে রাখা একটা ভাঙা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্যাসেঞ্জার দেখে-দেখে আমার চোখ এক্সপার্ট হয়ে গেছে। তা কী বিক্রি করেন আপনি?'

আমি এবার একটু উৎসাহ পেলাম। মাস্টারজিকে ইনসেক্ট সেন্টিনেলের কথা বললাম। ভাবলাম, যাকগে, আমার যন্ত্রের গুণপনা জাহির করেই ঘণ্টা তিন-চারেক কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগেই আমার বাঁ দিকে দাঁড়ানো সুট পরা ভদ্রলোক ধপ করে বসে পড়লেন দ্বিতীয় খালি চেয়ারটায়। সামান্য হেসে বললেন, 'হুঁ, আমিও একসময় এই লাইনে ছিলাম। সোলার ল্যানটার্ন—মানে সৌর লণ্ঠন বিক্রি করতাম। আপনি হয়তো নাম শুনে থাকবেন—চ্যাম্পিয়ন ব্র্যান্ড সোলার ল্যানটার্ন—'

নাম না শুনে থাকলেও আমি সৌজন্য দেখিয়ে ঘাড় নাড়লাম। ওঁকে একটা সিগারেট অফার করতেই মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

বাইরে ট্রেনের হুইসল শোনা গেল। ঘটাং-ঘট শব্দ তলে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল কোনও এক্সপ্রেস

ট্রেন। ঘরটা থরথর করে সামান্য কেঁপে উঠল। মাথার ওপরে বিশাল পাখাটা দুলে উঠল এপাশ-ওপাশ। তার ব্লেডের ছায়া ঘরের মেঝেতে জীবন্ত প্রাণীর মতো নড়তে লাগল।

ট্রেনের হুইসল শোনা গেল আবার—বহুদূর থেকে ভেসে এল। আর তার ছুটে যাওয়ার শব্দ মিলিয়ে গেল ধীরে-ধীরে।

যতদূর জানি কোনও স্টেশন দিয়ে থ্রু ট্রেন পাস করাতে হলে সিগনাল সবুজ করে দিতে হয়। মাস্টারজি তো আমাদের সঙ্গে বসে আছেন! তা হলে সিগনালের কাজটা করল কে?

'কে আবার, জগমোহন।' গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন মাস্টারজি, 'আমার পোর্টার।'

ভদ্রলোকের দেখি আশ্চর্য ক্ষমতা! না বলা প্রশ্নও দিব্যি টের পেয়ে যান!

আমি কৌতূহলের নজরে তাঁকে জরিপ করলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না।

জগমোহন নিশ্চয়ই প্ল্যাটফর্মে দেখা কম্বল মুড়ি দেওয়া সেই কবন্ধ। আর এখন আমার ডান দিকে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারই কোনও ভায়রাভাই। এই লোকটার পরিচয় এখনও আঁচ করতে পারিনি।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হেঁচকি তুলে হাসলেন মাস্টারজি। রুমাল বের করে বেশ জোরে নাক ঝেড়ে বললেন, 'এ হল রামাইয়া। গ্যাংম্যান—মানে একসময় গ্যাংম্যান ছিল। বছর চারেক হল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কাছাকাছি ঝোপড়িতে থাকে। মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে গল্প করতে চলে আসে—এই বিরজুবাবুর মতন—' কথা শেষ করে চিমড়ে প্রাক্তন সেল্সম্যানের দিকে হাত দেখালেন মাস্টারজি।

ভদ্রলোক হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন আমাকে। বললেন, 'আমার নাম ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব।'

আমিও প্রতিনমস্কার করে নিজের পরিচয় দিলাম।

আমাদের গল্পগুজব চলতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে সিগারেট। আমি ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে কাজ চালাচ্ছিলাম। শুধু রামাইয়া নীরব হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ওর কম্বল ঘিরে মশার দল পিনপিন করে উড়ছে। কিন্তু তাতে ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

কথাবার্তার ফাঁকে একবার ঘড়ি দেখলাম। সবে সাড়ে নটা।

সেটা লক্ষ করে মাস্টারজি বললেন, 'এর মধ্যেই ঘড়ি দেখছেন! আপনার ট্রেন তো সেই সকালে!'

ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব হাসলেন সেকথা শুনে, বললেন, 'এর মধ্যেই বোর হয়ে গেলেন! আমাদের বোর হলে চলে না। আমাদের ট্রেন আসবে সেই রাত দশটায়—'

'আমাদের' মানে কাদের? ব্রিজমোহনের সহযাত্রী কি আর কেউ রয়েছেন? তাছাড়া রাত দশটায় কোন ট্রেনই বা আসবে! কোথায় যাওয়ার ট্রেন?

একটা শীতের ঢেউ পাক খেয়ে গেল আমাকে ঘিরে। শ্রীবাস্তবের মুখ-চোখ কেমন অদ্ভুত লাগছিল আমার। যখন উনি কথা বলছেন, হাসছেন, তখন সবকিছু ঠিকঠাক মনে হলেও ওঁর চোখজোড়ায় কোনওরকম ছায়া পড়ছে না। চোখ দুটো যেন মরা কই মাছের মতো: তীক্ষ্ণ, অথচ প্রাণহীন।

হঠাৎই আমার কোমরের কাছ থেকে পিপ-পিপ শব্দ উঠল। আবার সেই হতচ্ছাড়া পেজার! দেখি এবার কী খবর পাঠাল হেডকোয়ার্টার।

শ্রীবাস্তব এবং মাস্টারজি প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কী, পেজার নাকি?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ—'

তারপর যন্ত্রটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে ধরলাম চোখের সামনে। মেসেজ রিসিভ করতে গিয়ে অবাক হলাম। কোথায় মেসেজ! শুধু সারি-সারি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ফুটে উঠেছে পেজারে।

বহু চেষ্টা করেও ওই অদ্ভুত মেসেজ আমি পালটাতে পারলাম না।

মাস্টারজি টেবিলের ওপারে আমার ঠিক উলটোদিকে বসে আছেন। পেজারের মেসেজ কোনওমতেই ওঁর দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু উনি গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কখন যে কী করে বসে কোনও বিশ্বাস নেই। তবে ওই জিজ্ঞাসা-চিহ্নই জীবনের সার

কথা। তুলসীদাস বলে গেছেন, মায়া ছায়া একসি বিরলা জানে কোয়/ভগতাকে পাছে লাগে সম্মুখভাগে সোয়। মানে, মায়া আর ছায়া একই....' শেষটা উনি বিড়বিড় করে কী যে বললেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অবশেষে ক্ষান্ত হয়ে পেজারটা আবার গুঁজে রাখলাম কোমরে।

রামাইয়া ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বোটকা গন্ধটা আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। আমার গা গুলিয়ে উঠল। অথচ বাকি দুজন দিব্যি নির্বিকার। ওঁদের দেখে মনে হচ্ছে ওঁরা যেন কোনও একটা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছেন—ট্রেনের জন্য নয়। অবশ্য মাস্টারজির ট্রেন ধরার কথাও নয়।

শ্রীবাস্তব হাত নেড়ে মশা তাড়ানোর চেষ্টা করে বললেন, 'মশার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই। গায়ে কামড় না বসিয়েও যদি আশেপাশে ওড়ে তা হলেও বিচ্ছিরি লাগে।'

আমি আবার একটা ছুতো পেয়ে একেবারে পাক্কা সেল্‌সম্যানের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঝুঁকে পড়ে সুটকেস খুলে একটা যন্ত্র বের করে নিলাম। কে বলতে পারে, যন্ত্রটা দেখেশুনে মাস্টারজি আর শ্রীবাস্তব হয়তো একটা করে কিনে ফেলতে পারেন! তাছাড়া কোম্পানির প্রচার তো খানিকটা হবেই।

একটা আই-এস মাস্টারজির টেবিলে রেখে যন্ত্রটার গুণাগুণ সম্পর্কে সাতকাহন বক্তৃতা শুরু করে দিলাম। মাস্টারজিকে তিন নম্বর সিগারেট অফার করে বললাম, 'যন্ত্রটা চালু করলেই এর অ্যাকশন দেখতে পাবেন। এ-ঘরের সব কটা মশা পালিয়ে গিয়ে একেবারে রেললাইনে গিয়ে শেলটার নেবে।'

মাস্টারজি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বারকয়েক নাক টানলেন। ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। লক্ষ করলাম, ওঁদের দুজনের চোখেই কৌতুক। সেটা আমার আই-এস-এর প্রতি তাচ্ছিল্য কিনা বুঝতে পারলাম না।

মাস্টারজি বিড়বিড় করে বললেন, 'মশার জন্য আমাদের খুব একটা অসুবিধে হয় না। তবু আপনি যখন বলছেন তখন চালু করুন—'

শীত-টিত ভুলে গিয়ে আমি যন্ত্রটাকে ঘরের সুইচবোর্ডের কাছে নিয়ে গেলাম। প্লাগপয়েন্টে মেইন্‌স কর্ডের প্লাগটা গুঁজে দিয়ে যন্ত্রটাকে বসিয়ে দিলাম মেঝেতে। তারপর মাস্টারজি আর শ্রীবাস্তবের দিকে অহঙ্কারী ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে তাকালাম।

এইবার হাত দুটো শব্দ করে ঝেড়ে নিয়ে একটু হেসে আই-এস-এর সুইচ অন করে দিলাম।

বিপর্যয়টা শুরু হল সঙ্গে সঙ্গেই।

আলট্রাসনিকের প্রকোপে পিনপিন করে ওড়া মশাগুলো যথারীতি পালাতে শুরু করল ঠিকই, তবে বাকি তিনজন মানুষও অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দিল।

জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাস্টারজি তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। দু'কানে আঙুল ঠেসে ধরে মুখ বিকৃত করে চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্ধ্ কিজিয়ে, সাব, উও শয়তান মশিনকো বন্ধ্ কিজিয়ে—'

শ্রীবাস্তবের আভিজাত্য তখন কোথায় উবে গেছে! দু'কানে হাত চেপে লাফিয়ে উঠেছেন তিনিও। আর জড়ানো স্বরে চিৎকার করে কী সব বলছিলেন।

রামাইয়া পাগলা কুকুরের মতো দাপাদাপি করে ঘরময় দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে।

সব মিলিয়ে সে এক বীভৎস অবস্থা।

অবাক ভাবটা কোনওরকমে কাটিয়ে উঠে আমি চট করে আই-এস-এর সুইচটা অফ করে দিলাম।

যন্ত্রটায় তো এমন কোনও গোলমাল নেই যাতে আলট্রাসনিকে মানুষের কোনও অসুবিধে হবে! তাছাড়া আমার তো কিছু হয়নি! তা হলে এই তিনজন মানুষ এরকম অদ্ভুত আচরণ করল কেন?

মাস্টারজি আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়েছেন। মাথা ঝুঁকিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলছেন।

শ্রীবাস্তব একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে একরকম যেন ঝুঁকছেন।

আর রামাইয়া ঘরের মেঝেতে বসে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর মাঝে-মাঝে ভয়ার্ত চোখে একটু দূরে রাখা যন্ত্রটার দিকে দেখছে।

আমি খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়লাম। কী বলব, কী করব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এমন সময় বহুদূর থেকে কোনও ট্রেনের হুইসল শোনা গেল।

হুইসলের শব্দটা অনেকটা আর্ত চিৎকারের মতো শোনাল।

আর ঠিক তখনই ঘরের সিলিং পাখাটা অতিকায় পেন্ডুলামের মতো ধীরে-ধীরে দুলতে শুরু করল।

শ্রীবাস্তব উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাল মাস্টারজির দিকে। চাপা গলায় বলল, 'ট্রেন আসছে... আমাদের ট্রেন...'

মাস্টারজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সোয়েটার-কোট টেনে-টুনে ঠিকঠাক করে নিলেন—যেন এখনই কোথাও বেরোবেন। আর রামাইয়া তার ক্লান্ত দেহটাকে ভাঁজ ভেঙে কোনওরকমে দাঁড় করাল।

আমি ঘড়ি দেখলাম। রাত দশটা হতে কয়েক সেকেন্ড বাকি।

ট্রেনটা ছুটে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তার ছোটার গতি বিন্দুমাত্রও কমছে বলে আমার মনে হল না।

এরপর যা হল তা কী করে আমি সইতে পেরেছি জানি না।

রামাইয়া এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল। চোখের পলকে ওর মুখ-মাথা ছিন্নভিন্ন তরমুজের মতো ফেটে চৌচির হয়ে রক্ত ছিটকে গেল চারপাশে। অথচ ওর কবন্ধ দেহটা তখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে।

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তখনও জানি না, এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা আরও ঘটবে।

রামাইয়ার পর শ্রীবাস্তবের পালা।

ওঁর চিৎকারটা অনেকটা ঘাড় মটকে দেওয়া মুরগির মতো শোনাল। আর পাটকাঠি ভাঙার মতো মড়মড় শব্দ হয়ে ওঁর পেটের ওপর আড়াআড়ি তৈরি হয়ে গেল বীভৎস ক্ষতচিহ্ন। সুন্দর পোশাক-আশাক রক্তে ভেসে গেল। প্যান্ট বেয়ে রক্তের ঢল গড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝেতে।

সেই অবস্থাতেই এক ভয়ঙ্কর উল্লাস ফুটে উঠল শ্রীবাস্তবের চোখে-মুখে। তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'ট্রেন এসে গেছে—রাত দশটার ট্রেন—'

মাস্টারজি হাসলেন—উন্মাদের হাসি। হাসতে-হাসতেই তাঁর মাফলার জড়ানো গলাটা ফাঁক হয়ে গেল। মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরে গেল উলটো দিকে, কিন্তু বাকি দেহটা সোজাসুজি আমার মুখোমুখি—অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো।

রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল টেবিলে, টেবিলের কাগজে। কোটের রঙ গাঢ় নীল হওয়ায় রক্তের দাগ তেমন করে বোঝা যাচ্ছিল না।

ওই অবস্থাতেই মাস্টারজি কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন।

সিলিং পাখাটা এখন আরও জোরে দুলছে। ওটার ব্লেডের ছায়া খেলা করে যাচ্ছে আমাদের চারজনের গায়ের ওপর।

'মাস্টারজি, চলুন, আর সময় নেই—' শ্রীবাস্তব তাড়া দিলেন মাস্টারজিকে।

তারপর আমার বিহ্বল চোখের সামনে তিন-তিনটে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মানুষ হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। ট্রেনের শব্দটা তখন প্ল্যাটফর্মে ঝড় তুলছে।

চলে যাওয়ার সময় মাস্টারজির পিঠটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। আর দেখতে পাচ্ছিলাম পিঠের দিকে ফেরানো তাঁর মুখটাও। সেখানে নানা জায়গায় রক্তের ছিটে, আর প্রশান্ত ভঙ্গিতে দু'চোখ বোজা।

মাস্টারজির ঠোঁট নড়ে উঠল : 'মায়া ছায়া একসি বিরলা জানে কোয়...'

ওঁরা তিনজন প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে তীরের মতো ছুটে গেলেন রেললাইনের দিকে। অন্ধকারে ওঁদের আর দেখা গেল না। ট্রেনের চাকার শব্দ রাতের অন্যান্য শব্দের গলা টিপে ধরল। বুক-ফাটানো রক্ত-হিম-করা আর্ত চিৎকার করে উঠল ছুটন্ত ট্রেনের হুইসল।

তারপর...

তারপর সব চুপচাপ।

শীতের বাতাস আর মশার পিনপিন শব্দ ঘিরে ধরেছিল আমাকে। তার একটু পরেই বোধহয় আমি ঘরের দরজার কাছে টলে পড়ে গিয়েছিলাম।

পরদিন বারডিহির ট্রেনে যখন উঠলাম তখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি। পোর্টার জগমোহন আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল।

ওর কাছেই শুনেছি, রাত দশটার ওই এক্সপ্রেস ট্রেনের তলায় গত পাঁচ বছরে তিনজন সুইসাইড করেছে : মাস্টারজি, ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব আর রামাইয়া। যখন বেঁচে ছিল তখন ওরা কেউ কাউকে খুব একটা চিনত না। কিন্তু মারা যাওয়ার পর কোনও-কোনও রাতে ওরা তিনজন দেখা দেয় ওই ভাঙাচোরা ঘরটায়। তারপর একসঙ্গে ঝাঁপ দেয় ওই ভূতুড়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের তলায়। এসবই জগমোহনের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে ট্রেনটাকে সে কখনও চোখে দ্যাখেনি—শুধু তার শব্দ শুনেছে।

আশ্বিন ১৪০৪